

## ঈদের আনন্দ-বেদনা

### কাজী জহিরুল ইসলাম

কোন এক রহস্যময় কারণে আঝা আমাদেরকে প্রায়শই বেশ লম্বা সময়ের জন্য গ্রামের বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। আমি বুঝতাম আঝা এতে বেশ বিরক্ত হতেন। কিন্তু কখনো তেমন জোড়ালো প্রতিবাদ করতেন না। কখনো তিনমাস আবার কখনো ছয়মাস আমরা আমাদের নানার বাড়িতে গিয়ে থাকতাম। আমি অবশ্য জীবন-যাপনের এই হঠাৎ পরিবর্তনে দারুণ খুশি হতাম। আমার নানার বাড়ি খাগাতুয়া গ্রামে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার নবীনগর থানায়। খাগাতুয়ায় আমার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল নিবারণ ঠাকুরের চোখ ফাকি দিয়ে শ্মশান ঘাটের পাতাল পুকুরের ওপর ঝুলে পড়া গয়ম (পেয়ারা) গাছ থেকে গয়ম চুরি করে আনা। আমি তখনো সাঁতার কাটা শিখিনি। যে অন্ধকার পুকুরের কালো পানির ওপর ঝুলে ছিল গয়ম গাছটি, সেই ভয়ঙ্কর পুকুরে কেউ কোনদিন নেমেছে বলে শুনিনি। শুধু মরা পোড়ানোর সংকারেই ওই পানি ব্যবহার হতো। লোকে বলতো এই পুকুরের কোন তল নেই, পাতালে গিয়ে ঠেকেছে। সেই পুকুরের ওপর ঝুলে থাকা গয়ম গাছের মগডালে চড়ে ডাসা ডাসা একেকটা গয়ম পেরে আনতাম। একবার টুপ করে নিচে পড়ে গেলেই সোজা পাতালপুরি। আর এদিকে নিবারণ ঠাকুরের লাঠির দৌড়ানিতো আছেই। এতেকিছুর পরেও সেই পেয়ারা গাছটি কেন যে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতো কে জানে?

তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। রোজার মাস। আঝা আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। গ্রামের ঈদগুলি আমার কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হতো না কখনোই। বরং রোজাগুলি ছিল এর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয়। সেই বছরই আমি প্রথম সবগুলি রোজা করি। ভোররাতে উঠে দই আর গুড় দিয়ে ভাত খাওয়া আমার কাছে ছিল খুবই আনন্দদায়ক একটি ঘটনা। ইফতারিতে তেমন জৌলুস ছিল না। ঢাকার মতো পিয়াজু, বেগুনি, ফুলুরি আর ছোলা-মুড়ির কোন কারবার নেই ওখানে। একগ্লাস লেবুর সরবত খেয়ে কিছুক্ষণ গরম গরম হরুম চিবানো। তারপর কোনদিন চিতই পিঠা, কোনদিন মেরা পিঠা, কোনদিন পাটিসাপটা। এরপরই গরম গরম ভাত খাওয়া। আমরা সবাই লাইন করে বসতাম। নানী আমার জন্য আর নানাজানের জন্য সিরামিকের বাটিতে করে তরকারি দিতেন। অন্যদের সরাসরি হাঁড়ি থেকে চামচে করে পাতে পাতে তুলে দিতেন। খুব মজার মজার রান্না হতো রোজার দিনে। শোল মাছের পোনা লেবুপাতা দিয়ে রান্না করতেন আমার নানী। টাকি মাছ সেদ্ধ করে কাটা ফেলে দিয়ে একটা দারুণ ঘন্ট বানাতেন। আর ডেকি মুরগির বিরান সালুন (তরকারি) রান্না করতেন ছোট ছোট আস্ত গোলআলু দিয়ে। কি অসাধারণ সেই রান্না। আমার সারাজীবনে দেশে বিদেশে যতো রান্না খেয়েছি আমার নানীর হাতের সেই রান্নাই আজো আমার কাছে শ্রেষ্ঠ রান্না বলে বিবেচিত। ঈদের আগেরদিন আঝা এসে হাজির। আমাদের জন্য নতুন জামাজুতো আর পোলাওয়ার চাল, সেমাই, চিনি, ঘিসহ এত্তো এত্তো বাজার নিয়ে এসেছেন। আমার আনন্দ আর ধরে না। গ্রামের ঈদগুলো সকালে নামাজ পড়ে গোরস্তান জিয়ারত আর কোলাকুলি করার মধ্যেই সিমীত ছিল। ঈদগাহ থেকে ফিরে আমার মামাদের দেখতাম পাঞ্জাবী খুলে লুঙ্গি-শার্ট পরে একটি অলস দিন কাটাচ্ছেন। দরিদ্র কৃষকেরা নামাজের পরে একটু মিষ্টান্ন মুখে দিয়ে ওইদিনও আর দশটা দিনের মতো দৈনন্দিন কাজে নেমে পড়তেন।

খুব ভোরে উঠে পুকুর থেকে গোসল করে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরি। আঝা নতুন কাপড়-চোপড় বের করে বসে আছেন। একে একে অন্য তিন-ভাইবোনকে নতুন কাপড় পরানো হলো। আমার জন্য আনা হয়েছে একটি ইংলিশ প্যান্ট, একজোড়া চামড়ার সেডেল আর একটি লাল-হলুদ চেক শার্ট। কাপড়ের প্যাকেট খুলেই আঝা হৈ-চৈ শুরু করে দিলেন। এইগুলি কি এনেছেন? এগুলি কি বাদলের গায়ে লাগবে? প্যান্ট এবং জুতো আমি পরতে পারলাম না। ওগুলো সাইজে এতোই ছোট ছিল যে কিছুতেই

আমার পক্ষে পরা সম্ভব হলো না। কাপড়ের জন্য আমার তেমন মন খারাপ হলো না। কারণ আমি গ্রামে যাদের সঙ্গে দাঁড়িয়াবাঁধা, টেম-ডাং, গোল্লাছুট আর গুল্লি খেলতাম ওরা কেউই ঈদে নতুন জামা পেতো না।

ঢাকার ঈদগুলো আমার কাছে খুবই জৌলুসপূর্ণ মনে হতো। আশ্মা চাঁদরাতের দিন রাত আটটা থেকে রান্না শুরু করতেন। সকালে রান্না শেষ করে আমাদের ডেকে তুলতেন গোসল করে মসজিদে যাওয়ার জন্য। পোলাউ, খিচুরি, মুরগির কোরমা, মুরগির ঝাল মাংস, গরুর রেজালা, দুই-তিন রকমের সেমাই, পায়েশ আরো কতো কী রান্না করতেন। আমরা নামাজ পড়ে এসে খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে পড়তাম ঈদি সংগ্রহের জন্য। যেসব মুরুব্বী আত্মীয়-প্রতিবেশীদের তেমন পছন্দ করতাম না, ঈদের দিন সকালে তাদেরকেও ভক্তিসহকারে সালাম করতাম ঈদির আশায়। ঈদের দিন তিনিই সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিতে পরিনত হতেন যিনি সবচেয়ে বেশি ঈদি দিতেন। আঝা একতাড়া নতুন নোট এনে রাখতেন। নামাজ পড়ে এলে আমাদের সবাইকে ডেকে ডেকে চকচকে নতুন টাকা দিয়ে আদর করতেন।

আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা একবার ভয়ানক রকম খারাপ হয়ে যায়। আমার মনে আছে ছুটির দিনে আমাদের বাসায় পোলাউ-মাংস রান্না হতো। সে বছর আমি গুলশান বাজার থেকে ছুটির দিনে মাংসের পরিবর্তে খাসির মাথা কিনে আনতাম। একটা খাসির মাথা তখন ছিল ১৫ টাকা আর এক কেজি গরুর মাংসের দাম ছিল ৪০ টাকা। সামনে ঈদ। তখন শীতকালে ঈদ হতো। ঈদের কদিন আগেই আমাকে নতুন স্কুল ড্রেস বানিয়ে দেওয়া হলো। বাটা থেকে একজোড়া কাপড়ের জুতোও কিনে দেওয়া হলো। যেহেতু মাত্র ক’দিন আগেই আমার ড্রেসের জন্য এতোগুলো টাকা খরচ হয়ে গেল তাই এবার ঈদে আমি আর নতুন ড্রেস পেলাম না। আমার খুব মন খারাপ। নামাজে যাই নি। সেমাই খাইনি। কারো বাসায় বেড়াতেও যাই নি। যাবো কি পরে? স্কুল ড্রেস পরে কি ঈদের দিন কারো বাসায় যাওয়া যায়?

বিকেলের দিকে আমি বাড়ির উঠানে একটা বেতের চেয়ারে বসে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। আমার ছোটবোন শাহনাজকে সে বছর একসেট নীল শেলোয়ার-কামিজ বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সারা সকাল ও সেই নীল শেলোয়ার-কামিজ পরে পরীর মতো উড়ে বেড়াল। কী-যে সুন্দর লাগছিল ওকে। বিকালে আমাকে কাঁদতে দেখে ওরও খুব মন খারাপ হলো। শাহনাজ ওর ড্রেসটি আর পড়লো না। সে তার ড্রেসটি আমার কাছে নিয়ে এসে বললো, ভাইয়া আপনি এটা পরেন। আর আমি কী করলাম। ওর সেই শেলোয়ার-কামিজ পরে সারা বিকেল ঘুরে বেরালাম।

বড় হয়ে যখন রোজগার করতে শিখলাম তখন আর নিজের জন্য কিনতে ইচ্ছে করে না। স্ত্রী-সন্তানের জন্য কিনি। বাবা-মা, ভাই-বোনের জন্য কিনি। ঈদের আগের দিন সকলের হাতে উপহারসামগ্রী তুলে দিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। তাকিয়ে থাকি সকলের হাসিমুখ দেখার প্রত্যাশায়। কখনো যদি কারো মুখে বিষণ্ণতার আভাস দেখি বুকটা ভেঙে যায়।

পেশাগত কারণে বিদেশে বিদেশে থাকতে হয় বলে এখনতো প্রায়শই দেশের বাইরে ঈদ করি। এখন ঢাকার অভাব নেই। ইচ্ছে হলেই ড্রেস কিনতে পারি, ইচ্ছে হলেই জুতো কিনতে পারি। কিন্তু সেই আনন্দ আর নেই। শত অনটনের ভেতর প্রিয়জনের সান্নিধ্যে ঈদ করার যে আনন্দ, সেই আনন্দ থেকে এখন আমি প্রায়শই বঞ্চিত হই।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৮ অক্টোবর, ২০০৬

